ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 102-109
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.275

‘অশ্বযোনি’: নারীর জীবন সংগ্রামের উপাখ্যান

পরশুরাম রজক, *সহ শিক্ষক, আশ্বিনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Among those who emerged at the turn of the twentieth and twenty-first centuries and showed new directions to Bengali fiction, Bani Basu is eminent. She is distinguished by virtue of her unique narrative technique and analytical insight. In her fiction, women are vibrant, expressive, and full of life. Alongside portraying the suffering of women’s lives, she also sheds light on their social positioning.

She has closely observed the dynamic life of Kolkata and has seen how people, as travelers on the path of life’s struggle, move forward along the road of progress. This path is neither smooth nor comfortable. To secure the means of survival, people must constantly struggle—and women must struggle far more. Women are compelled to build strong resistance against patriarchy, and only then can they choose the path of progress. Along this path, women repeatedly become victims of exploitation and oppression. At times, they surrender themselves to the conventional flow of life; at other times, they rise again, choosing their own rhythm of life.

Bani Basu has created timely and relevant female characters in her novels such as Antarghat, Pancham Purush, Shwetpatharer Khala, Uttar Sadhak, Gandhabi, Ekush-e Pa, Amrita, Khanamihirer Dhipi, and Maitreya Jatak. Among her distinguished novels is Ashwayoni, by the author of Maitreya Jatak, which chronicles the formation of an independent female identity along the path of protest.

Rajeswari is an unwanted child of her parents’ old age; she is dark-skinned. An inevitable neglect, bestowed by nature, marks her forehead. The patriarchal structure of a wealthy family marginalizes her.

Eight years ago, she left the Goswami family—that is, both her parental home and her husband’s family—and chose an independent life and livelihood. She is now established as a writer and critic. With her self-earned income, she lives independently in a modest apartment on the outskirts of South Kolkata, along with her son Babui, given to her by her husband Saheb. She is divorced. Having refused to compromise with any form of injustice, she remains alone—and in this solitude lies her freedom.

Keywords: Bani Basu, Bengali fiction, women’s identity, patriarchy, resistance

বাণী বসু একজন স্বনামধন্য কথাকার। বিংশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম, একবিংশ শতাব্দীতে বাস। দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের জীবন অভিজ্ঞতায় তিনি সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ তাঁর সাহিত্যকীর্তি। আজন্ম পরিচিত কলকাতার চলমান জীবন

ও জিজ্ঞাসা তাঁর সাহিত্যে সমাদর পেয়েছে। 'মৈত্রেয় জাতক' খ্যাত বাণী বসুর 'অশ্বযোনি' (২০০৯) উপন্যাসটি নারীর সুগভীর জীবনবোধ ও আশ্চর্য নির্মাণ কৌশলে কালোত্তীর্ণ।

উপন্যাসটি একজন নায়িকার জীবন সংগ্রামের উপাখ্যান। নাম রাজেশ্বরী ওরফে খুকু। তার জীবন সংগ্রামকে পূর্ণতা দিতে এবং বহু কৌণিক দৃষ্টিতে তার চরিত্র পর্যালোচনা করতে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন মা সুহাসিনী, দিদি পরমেশ্বরী, বিলেশ্বরী, ফুলেশ্বরী সহ ময়না, জারিনা প্রমুখ চরিত্রকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চিরাচরিত জীবন প্রবাহে ভেসেছে, কেউ আবার নিজস্ব জীবন ছন্দ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত হার মেনেছে গতানুগতিকতার কাছে। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্র রাজেশ্বরীর চরিত্রের মৌলিকতা স্পষ্ট করেছে; পর্যবশিত করেছে নায়িকা চরিত্রে।

শেফালী মৈত্র বলেছেন-

> "সমাজের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে, সমাজ পরিচালনায় নারীরূপে কর্তৃত্ব পেতে গেলে (পুরুষের ছায়াবলম্বনে কর্তৃত্ব না-চাইলে) নারীকে নিজের কথা নিজের মতো করে বলা শিখতে হবে। তাকে স্পষ্ট করে বুঝতে হবে সে কী চায়। তার অভাব-অভিযোগগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। নারীর নিজের কথা নিজের মতো করে বলা প্রয়োজন। তাকে বুঝে নিতে হবে কোন স্বরটি তার নিজের, আর কোনটি বা ধার-করা। এর জন্য ভাষার ওপর দখল থাকলেই হবে না, তার সঙ্গে চাই চিন্তার স্বচ্ছতা।"[১]

বাণী বসু নারী, তাঁর ভাষার দখলের সঙ্গে চিন্তার স্বচ্ছতা নায়িকা রাজেশ্বরীর আত্মকথনে ও উপন্যাসের সংলাপধর্মীতায় প্রকাশিত।

রাজেশ্বরীর জন্মমুহূর্তে সংগ্রামের বীজ নিহিত-

১. সে তারা বাবা মায়ের শেষ বয়সের অনিচ্ছার সন্তান। তার জন্মের সময় বাবা নারায়ণ গোস্বামীর বয়স ষাট বছর, মা সুহাসিনীর বয়স চল্লিশ বছর।
২. সে তার বাবা মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান। লালদা, নীলদা, দুলদা, বিলদি, ফুলদি, ভুলদা প্রমুখ ছয় জনের পর তার জন্ম। তা ছাড়া পরমেশ্বরী নামের সবার বড় সতাতো দিদি রয়েছে তাদের।
৩. সে কালো। ঔপনিবেশিক মানসিকতা পুষ্ট মানুষ যাকে সুন্দর নয়, অসুন্দর মনে করে।
৪. বাবার অস্ংযত যৌন লালসার ফসল সে।
৫. সে তার মায়ের উদাসীন, অবহেলিত প্রসব পিণ্ড ছাড়া কিছু নয়।

তার ললাটে প্রকৃতি প্রদত্ত অনিবার্য অবহেলা। বিত্তবান পরিবারের পরিবার তত্ত্ব তাকে কোণঠাসা করে তোলে। তার গাত্রবর্ণ কালো। কালো মেয়ের প্রতি পরিবারের নেতিবাচক মানসিকতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্ট–

> "এরা পুজো করে এক শ্যামাঙ্গিনীকে ঋতুতে ঋতুতে, এক কৃষ্ণাকে বছরভর, অথচ কালো মেয়ে এদের দুটি চক্ষের বিষ। কালো, কালো, কালো!"[২]

এ ভাবনা পুরুষতন্ত্রের মূলে আঘাত করে।

আট বছর আগে গোস্বামী পরিবার অর্থাৎ তার বাবার পরিবার এবং তার স্বামীর পরিবার ত্যাগ করে স্বাধীন জীবন ও জীবিকা বেছে নিয়েছে রাজেশ্বরী। নিজ উপার্জিত অর্থে দক্ষিণ কলকাতার প্রান্তিক আবাসনে তার স্বাধীন বসবাস। সঙ্গে তার স্বামী সাহেব ভট্টাচার্য প্রদত্ত পুত্র বাবুই। সে ডিভোর্সি। কোন প্রকার অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেনি বলে সে একা। একাকীত্বে তার মুক্তি।

আট বছর পর 'গোস্বামী গোষ্ঠী' অর্থাৎ তার দাদা- লালদা, নীলদা, বিলদা, মা সুহাসিনী, দিদি- বিলদি, ফুলদি জমিজমা স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে আইনি জটিলতায় পড়েছে বলে তার ডাক পড়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যায় লালদার বাড়ি।

ঔপন্যাসিক এরপর রাজেশ্বরীর অতীতের কথা স্মরণের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বাস্তব জীবনবোধ ও তার সঙ্গে রাজেশ্বরীর মানসিক যন্ত্রণা। যেখানে আমরা দেখি রাজেশ্বরী অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। জন্মের পর থেকে তার ও ভুলদার কাছ থেকে মা ছিল অনেক দূরে। বড়দি পরমেশ্বরীর স্নেহ ও পরিচর্যায় ধীরে ধীরে বড় হয়েছে সে। সে জানতই না যে গোস্বামী পরিবারে মোনালিসা চরিত্রের অধিকারী, ভেনাস ফিগার সুহাসদি তার মা। মাকে ছাতের দরজার আড়াল থেকে ফুল তুলতে, ফুলের গাছে জল দিতে, লাইব্রেরিতে জোরে মহাভারত পড়তে, রান্নাঘরে বামনির সঙ্গে সামান্য কথা বলতে, ছাতের ট্যাংকে সরময়দা মেখে গামছা ও ঝামা ঘষে স্নান দেখেছে সে। মাকে সামান্যটুকু কাছে পাওয়া যেত দালানের মোড়ায় বসে চা-মুড়ি খাওয়ার সময়। হৃদয়ের কাছে মা নেই, আছে বড়দি। যে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে মৃত্যু বরণ করেছে। যা অনায়াসে, বিনা প্রতিবাদে, বিনা মনোযোগে মেনে নিয়েছে গোস্বামী পরিবার। একে সতাতো, তার উপর বাবা নারায়ণ গোস্বামীর উদাসীনতায় সে ন্যায় পায়নি। শুধু তার ছেলে টুকাই তাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। বাবা নারায়ণ গোস্বামী মহর্ষি। একসময় অনেক উপার্জন করে বিষয় সম্পত্তি করে নিয়েছে। এখন ভক্তি ও পরামর্শদানে নিজেকে বিষয় ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। রাজেশ্বরীর আত্মবিক্ষণ স্পষ্ট-

> "বুঝলুম উনি সেইন্ট, বুঝলুম মোনালিসা দেবীস্বরূপিণী। কিন্তু আমরা কে? আমাদের অবস্থান কোথায়? আমরা কেন এত সাধারণ? বিশেষত আমি! এবং ভুলদা-ও।"[৩]

ভুলদার বুদ্ধি বাড়েনি। তার ছেলেমানুষি ব্যবহারে, খাবার সময় বাবা তাকে 'ভুল ভৈরব' বলতেই রাজেশ্বরী হৃদয়াবেগে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে-

> "-না ও ভুল না, ও ভুল না, তোমরা ভুল... তোমরা সব্বাই ভুল। মহর্ষি ভুল, লালনীলবিলফুলদুল সব সব্বাই ভুল।"[৪]

বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ মনোযোগ আদায় করতে সেবাদাসী ময়নাকে দূরে সরিয়ে বাবার কাজকর্মে সহায়ক হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। অন্তরের প্রেরণাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে খুকু ব্যবহারিক শিক্ষা নয়, স্কুলশিক্ষার মাধ্যমে উত্তরণের শিক্ষা অর্জন করতে চায়। নীলদা তাকে স্কুলে ভর্তি করে। স্কুলশিক্ষা চলাকালীন দাদাদের অকর্মন্যতা তার নজরে আসে। মাধ্যমিক চলাকালীন বিষয়-সম্পত্তি, উকিল পরামর্শে সামিল হয়ে তার বুদ্ধিপাকতে থাকে।

তার জীবনে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটে স্নাতককালে, কলেজে পড়াশোনার সময়। বিয়ে ঠিক হয় তার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় উকিল সাহেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বাবার মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে তার বিয়ে ছিল নিত্যান্ত প্রয়োজনের বিয়ে। তাদের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করত সাহেবের বাবা যোগেশ ভট্টাচার্য। বকলমে সাহেব। সুহাসিনী বলে-

> "খুকু তোমার বাবা যে নেই তাতে করে একটা মস্ত বড় তফাত হয়ে গেছে। বিষয় সম্পত্তির হালচাল, কোথায় কী আছে, এসব আমি কিছুই জানি না। সাহেব জানে। কিন্তু সে আমাকে কিছুই বোঝাচ্ছে না। সাহেব যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি বুদ্ধিমতী এর চেয়ে বেশি কিছু তোমায় বলবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তোমার লেখাপড়ার কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি পড়াশোনা করে আইন পড়ো এই আমি চাই।

> বিবাহিত জীবনেও সুখী হবে এই আমার আশা। আমার চারদিকে নেকড়েরা নিশ্বাস ফেলছে, তরোয়ালটা একমাত্র তোমারই হাতে।"[৫]

সাহেব যে সুহাসিনীকে ব্ল্যাকমেল করছে, এই ব্ল্যাকমেলের জায়গাটা তৈরি হয়েছে নারায়ণ গোস্বামীর উদাসীনতায়। দাদাদের অকর্মন্যতায়।

বাবা নারায়ণ গোস্বামীর মৃত্যুর পর গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয় রাজেশ্বরী। সে বিয়ে করতে নারাজ হলে তাকে ধর্ষণ করে সাহেব। যার ফল সাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে। বাবুই-এর জন্ম। বিয়েই কি একমাত্র প্রতিকার ছিল? এটাই কি ন্যায়? সাহেব ভট্টাচার্যের একার পরিবারে রাজেশ্বরীর অবস্থান হলেও সবকিছু মন থেকে মেনে নিতে পারেনি সে। সাহেব দাদার মতো হয়ে থেকেছে তার কাছে। সম্পর্কের পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি রাজেশ্বরী। তার মুখে 'সাহেবদা' ডাক ছাড়া কোন সম্পর্কের আলাপ নেই। মা সুহাসিনী রাজেশ্বরীকে সাহেবের 'সুহাসদি সুহাসদি' করে আদিখ্যেতা করার কথা জানালে রাজেশ্বরী গর্জে ওঠে। গোস্বামী পরিবারে জামাইয়ের মতো যাতায়াত না থাকায় সুহাসিনী সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করে। গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান এলে রাজেশ্বরী বেছে নেয় গর্ভপাতের পথ। নীলদা বারণ করলে সে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ–

> "না, আর না, এবার আমাকে নিজের ভালোমন্দ নিজের হাতে নিতে হবে, খালি পরের ইচ্ছা পালন করে যাওয়ার জীবন আমি মানব না।"[৬]

পূর্বের ঘটনার জের টেনে ডিভোর্স। নতুন জীবনের সূচনা এখানে।

রাজেশ্বরী এম এ পাশের পর ইউনিভার্সিটির ক্যানটিন চালায় বন্ধু রত্নাকরের ব্যবস্থাপনায়। চলে উপার্জন, পায় সাফল্য। তারপর শুরু করে হোম ডেলিভারি সার্ভিসের ব্যবসা। গোস্বামী পরিবারের লোকেরা, যারা তাকে বাড়ি থেকে এক রকম বের করে দিয়েছিল তারাই গতায়াত শুরু করে রাজেশ্বরীর ফ্ল্যাটে। কিন্তু সাহেব ভট্টাচার্যকে তারা কাজেকর্মে নিমন্ত্রণ করতে ছাড়ে না। প্রাণপণ চেষ্টা করে সুসম্পর্ক বজায় রাখার। রাজেশ্বরীর ভাবনা-

> "সংসারের ক্ষমার অযোগ্য ক্রাইম বা পাপগুলো সম্পর্কে ওদের কোনও চেতনাই নেই। সমাজে গণ্যমান্য বা টাকাপয়সাওলা মানুষমাত্রেই ওদের কাছে ক্ষমা পায়। যেমন আমিও পেয়েছি। একদা সৃষ্টিছাড়া, বিবাহিত স্বামীর একদিনের যৌন উন্মাদনাকে মেনে নিতে না পারা, গর্ভের বৈধ সন্তানকে হত্যা করা রীতিমতো ঘৃণ্য আসামি বলে স্থির হওয়া, বাড়ির মধ্যে একঘরে আমি যেদিন নিজের ফ্ল্যাটে পা দিলুম সে দিনই অভিনন্দন এসে পৌঁছাল, কালামনিস্ট হিসেবে যখন চারদিকে নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে তখনই আবার রাশি রাশি অভিনন্দন।"[৭]

মায়ের কাছ থেকেও অভিনন্দন পায় রাজেশ্বরী।

রাজেশ্বরী বন্ধু রত্নাকর ও সুদেবদার সহায়তায় ও পরামর্শে পদার্পন করে লেখালেখির জগতে। সংবাদ পত্রে লেখা শুরু হয়। প্রবন্ধ, সমালোচনা, নক্সা জাতীয় রচনা সবকিছুতেই তার সাফল্য। তার নক্সা সিনেমার রূপ পায়। এ যেন তার নিজস্ব জগৎ। পরিচয় হয় কলম্বিয়ার তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচক নিক অ্যাডামস-এর সঙ্গে। বাংলাদেশে রাজেশ্বরী নিকের কাজের সহায়ক। ছেলে বাবুই বিষয়ে নিক ভাবিয়ে তুলেছিল রাজেশ্বরীকে। মায়ের সান্নিধ্যে বাবুই-এর অপ্রাপ্তির কিছু নেই একথা রাজেশ্বরী জানালে নিক বলেছিল-

> "-তুমি মনে করছ নেই। ও মনে করছে আছে। কেননা চারদিকে ও অনেক ওর সমবয়স দেখছে, যাদের পারিবারিক ঐক্য আছে। ওকে অন্তত বলে দেওয়া ভালো, কী অলঙ্ঘ্য বাধার বা অমিলের জন্য ওর পরিবার ভেঙে গেল।"[৮]

পরিবার তত্ত্বের এক জটিল ভাবনায় পড়ে যায় রাজেশ্বরী।

রাজেশ্বরীকে চিনতে পেরেছে নিক। বলেছে-

> "তুমি একটি অশ্ব, বন্য, স্বাধীন, কিন্তু তুমি যূথ ছাড়া। এবং উদ্‌ভ্রান্ত, যদিও পেশল উচ্চশ্রেণির কোনও জীবের মতো তোমার অহংকার আছে, জেদ আছে, সব কিছু অস্বীকার করবার জেদ।"[৯]

সাহেব যখন মারা যায় তার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেয় ছেলে বাবুই-এর নামে। শর্ত শুধু একটাই তার শেষকৃত্য তার ছেলে বাবুই-এর হাতে যেন সম্পূর্ণ হয়। সমস্তটাই ছিল রাজেশ্বরীকে হার মানাবার চেষ্টা। সম্পত্তি লেখার বিষয়ে। অবশ্য প্ররোচনা দিয়ে ছিল সুহাসিনীই। বাবুই তার বাবার সমস্ত সম্পত্তি টাকা দিয়ে যাওয়াকে ভালোবাসা মনে করেছিল। ছেলে বাবুই-কে রাজেশ্বরী কাছ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা। পুরুষতন্ত্রের মোহ আবিষ্কৃত হয় এখানে।

দিদা সুহাসিনীর দানপত্রে টুকাই ও চয়ন যে কারচুপি করে ছিল তা ধরে ফেলেছিল রাজেশ্বরী। ফৌজদারী মামলা থেকে নিস্তার পেতে টুকাই ও চয়ন রাজেশ্বরীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলে সে বিক্রি করে টাকা মাকে দেয়। মা সবটাকা সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়। পুরুষের যেনতেন প্রকারেণ সম্পত্তির অধিকার লাভের বাসনা যেন মজ্জাগত। উদাহরণ টুকায় ও চয়ন।

ঔপন্যাসিক নারী চরিত্র পরমেশ্বরীকে, ফুলেশ্বরী-বিলেশ্বরীকে সাধারণ ভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত্ব শুধু পেয়েছে মা সুহাসিনী। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সংগ্রাম যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে। সেখানে এক প্রজন্ম মা সুহাসিনী ও অন্য প্রজন্ম রাজেশ্বরী। সুহাসিনীর মনে ছিল পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ। দেহে ছিল অপার সৌন্দর্য। নারায়ণ গোস্বামীর জ্ঞানের পরিধি পারঙ্গমতা দেখে মোহিত হয়েছিল। তাকে পড়াতো বলে বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে সুহাস তার সঙ্গে পালিয়ে আসে তারকেশ্বরে। সম্পত্তির অধিকার দিতে হবেনা বলে তার একমাত্র কাকা তার আর কোন খোঁজ নেবার চেষ্টাও করেনি। সুহাসের ভক্তিশ্রদ্ধার সুযোগ নিয়েছে নারায়ণ গোস্বামী। স্বপ্নের দাম্পত্য তার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বাইরের পৃথিবীর প্রতি টান ও ডিপ্লোম্যাট হবার ইচ্ছা যেই নারায়ণ গোস্বামী টের পেয়েছে অমনি তাকে বেঁধেছে। পুরুষ সে বন্ধনে বারবার বাঁধতে চায় নারীকে। মাতৃত্বের বন্ধনে। একে একে জন্ম হয়েছে লাল, বিল, নীল, ফুল, দুল। বাঁধন যখন অসহ্য নারায়ণ গোস্বামীর প্রবৃত্তির তাড়না যখন অদমনীয় তখন এক যৌবনবতী মেয়ে ময়নাকে এনে দেয় সুহাসিনী। সুহাসিনী এরকম করতে পেরেছে বা নারায়ণ গোস্বামী তা মেনে নিতে পেরেছে বলে রাজেশ্বরী বিস্মিত হলে সুহাসিনী বলে-

> "আমি নাচার মা। ভালোবাসার মানে আমার কাছে অন্যরকম ছিল।"[১০]

প্রবৃত্তির বশবর্তী পুরুষ সম্পর্কে সুহাসিনীর মনোভাব একেবারে নেতিবাচক-

> "পুরুষরা নতুন সঙ্গী পেলে বেশ পুলকিত হয়, স্বরভেদেও কিছু আসে যায় না। অত মানসিক মিল, ভালোবাসা এ সবের ধার ওরা ধারে না। কিন্তু তাতেই বা উনি তৃপ্ত হতে পারলেন কই? তাই অবশেষে ভুল, এবং তুমি। ব্যাস, আমার আর ক্ষমতা রইল না, উনি আমার কাছে হেরে গেলেন।"[১১]

সুহাসিনী মন থেকে কোনো সন্তানকে মেনে নিতে পারেনি-

> "আমার একার দায়িত্বে তো কেউ জন্মায়নি। যাঁর আসল দায়, তিনি দেখুন। কাঁথা পাল্টান, কোলে নিয়ে ঘুরুন, রাত জাগুন, দুধ খাওয়ান, খেলা দিন। নিজে আরামচেয়ারে বসে পড়াশোনা

করবেন, আর বক্তৃতা দিয়ে লোক মজাবেন, আর আমি এত ক্ষমতা নিয়ে, ইচ্ছে নিয়ে ন্যাতাক্যাতা হয়ে থাকবো এ তো হয় না! আমার একার দায়িত্বে- এতো হয়না।"[১২]

নারায়ন গোস্বামী সুহাসিনীকে সন্দেহ করত বলে সেও সন্তানদের মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদের স্থান পায়নি বলে একটু বিশেষ ছেলে নীলকে সহ্য করতে পারেনি সুহাস। কনিষ্ঠা মেয়ে রাজেশ্বরীকে দূরে ঠেলে দিলেও পরিবারতত্ত্বের নিষ্ঠুর জিন ভাঙা মেয়ে রাজেশ্বরী তার কাছে মূল্যবান। সুহাসিনী বলে-

"পরিস্থিতিকে তুমি বরাবর অগ্রাহ্য করে গেছো। কোনও কিছুর জন্যে বসে থাকোনি তো মা। তোমার লেখাপড়া একটার পর একটা জীবিকা টিকে থাকবার জন্যে, সব পার করে নিজের কাজটা চিনতে পারা, সেই কাজের মধ্যে সসম্মানে থাকা–এ সব তো নতুন, একেবারে নতুন জিনিস! কটা মানুষ ভাবতে পারে এ ভাবে? একটা ভুল মানুষকে জীবন থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য তুমি কী কষ্টটাই না করলে! তারও পরে, তুমি মাতৃস্নেহে মানুষ করতে পারলে ওই সাহেবজাত ছেলেকে। খুকু এখানে তোমার আমার ওপর জিত।"[১৩]

সুহাসিনী নারী। সাহেবের মন মানসিকতা তার কাছে স্পষ্ট। সাহেবের সম্পত্তি যে তাদেরই আত্মস্থ করা একথা বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি। মফস্বল আদালতের সামান্য রোজগার করা উকিল সাহেবের একমাত্র প্রেম রাজেশ্বরী। কিন্তু প্রেমের আড়ালের সত্য উদঘাটন করেছে সুহাসিনী-

"তবে জেনে রেখো খুকু প্রেম ট্রেম নয়, লোকটা বিকারগ্রস্ত। ওর বাবা ছিলেন বিশুদ্ধ প্রেমিক। যা পাওয়া যায় না তা কখনো চাইবার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। ও একটা মূর্খ, ভণ্ড। ও আমাকেও চেয়েছিল, তোমাকেও চেয়েছিল। না পেয়ে ক্রমাগত টাকা চাইতে লাগল।"[১৪]

সুহাসিনীর প্রতি লোকের আকর্ষণ ছিল প্রবল। কিন্তু নারায়ণ গোস্বামীর মতো প্রেমিক পেয়ে তার মন আর ধরেনি কোথাও। কিন্তু যখনই সুহাসিনী দেখলো সবটাই মিথ্যে, মেকি তখনই 'বর্ন ডিপ্লোম্যাট' দেওয়ানের মেয়ে সুহাসিনী পরিবারের বিষয় সম্পত্তি অধিকার করার, নিজেকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠা করার বাসনায় ম্যানেজমেন্ট শিখে নিয়েছে। কৌশলে সাহেবকেও বেঁধেছে। সাহেবের দুর্বলতা বুঝতে পেরে মেয়ে রাজেশ্বরীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে।

ফুলেশ্বরীকে ভালোবাসতো সুহাসিনী। যখন দেখে ফুলেশ্বরী এম এ পাশ করেও পরিবারতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পন করেছে তখনই মুখ ফিরিয়েছে। সুহাসিনী নিজের অদম্য এগিয়ে চলা আবিষ্কার করেছে রাজেশ্বরীর মধ্যে।

উপন্যাসে জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত আর এক নারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সে জারিনা। ফুলেশ্বরীর ছেলে চয়নের স্ত্রী। বারাঙ্গনা। নাটক, সিনেমায় অভিনয় করে। রাজেশ্বরীর লেখা নক্সাজাতীয় রচনার রূপান্তরিত সিনেমায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছে। তার মনের কোটরে বাসা বেঁধে থাকা আকুলতাকে আবিষ্কার করেছে রাজেশ্বরী। যে আকুলতায় ভর করে জারিনা এগিয়ে যেতে চায় জীবনের পথে। যেখানে চয়নের সম্পর্ক তার কাছে ম্লান। আসলে নির্যাতন, বঞ্চনা ও যন্ত্রনার কষ্টিপাথরে সে হয়ে উঠেছে প্রগতিশীল নারী। পরপর দুটো ডিভোর্স করেছে সে। তাই সে সকলের দৃষ্টিতে বারাঙ্গনা। তাকে তার মতো মেনে না নেওয়ার সমস্ত প্রকার বাধা সে অতিক্রম করতে চায়। তাই চয়নের প্রতি তার টান ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। পরপর দুটো ডিভোর্স করেছে সে। ডির্ভোস বিষয়ে রাজেশ্বরীকে স্পষ্ট জানিয়েছে-

"ছোটমাসি ডিভোর্স তো আপনিও করেছেন, কেন মেয়েদের ডির্ভোস করতে হয়, জানেন না?"[১৫]

এ জিজ্ঞাসাই রাজেশ্বরীর কাছে তাকে বিশেষ করে তুলেছে। রাজেশ্বরী জারিনের মধ্যে আলোক সন্ধানী মন আবিষ্কার করেছে।

জারিনের বাবা-মা মৃত। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার কাছে থাকত। বাবা মদ খেলে অমানুষ হয়ে যেত। মারত। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করত। স্কুলের হেড মিসট্রেসের কাছে কাতরভাবে আশ্রয় চাইলেও কোন সুরাহা হত না। বাবা গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাওয়ার পর সে পরিচয় পর্যন্ত দেয়নি। চাপ সামলাতে না পেরে এগিয়ে চলার বাসনায় 'উটপাখি'র পরিচালক, প্রযোজক বিপত্নীক অর্ধেন্দুদার কাছে আশ্রয় নেয়। বাড়ির সব কাজ, সেক্রেটারির সব কাজ করে দিত সে। বদনাম থেকে বাঁচতে, আর অর্ধেন্দুদাকে বাঁচাতে বিয়ে করে সে। অর্ধেন্দুদার সঙ্গে বিয়ে টিকল না যখন দ্বিতীয় বিয়ে। সেখানে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে ডিভোর্স। রাজেশ্বরীকে বলে-

> "আমি এখন বুঝছি বিয়েটিয়ে আমার জন্যে নয়। একাকিত্বই আমার নিয়তি।"[১৬]

বন্ধুহীন, অভিভাবকহীন, নেগেটিভ বিয়ের শিকার জারিন বয়সে ছোট চয়নকেও ছাপিয়ে এগিয়ে যেতে চায় জীবনের পথে।

ঔপন্যাসিক নারীকে দিতে চান মুক্তির স্বাদ। এ মুক্তি নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায়। যার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে সংগ্রাম। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষে জীবনের পথে এগিয়ে চলাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব কখন রীতিতে। উপন্যাসের শেষে তিনি বলেছেন-

> "অশীতিপর এক যুবতী যিনি লাগাম আর জিনের দিক থেকে ক্লান্তিহীন মুখ ফিরিয়ে গেছেন, কিন্তু মুক্তি পাননি, ঊনচল্লিশ বছরের তাঁর মেয়ে যে ছিঁড়ে ফেলেছে লাগাম, মুখ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তবু পরেনি, ছুড়ে ফেলে দিয়েছে জিন রেকাব লেজের এক একটা ঝাপটায়, আর মধ্য বিশের আমার এই কন্যা যে লাগাম দেখবামাত্র তাকে চিনতে পেরেছে। আমি তার বাঁকানো গ্রীবার ওপর হরষিত রোমরাজি দেখতে পাচ্ছি। এত এতকাল পরে আমার পরিবার পূর্ণ হল। তীব্র হ্রেষা শুনতে পাই। এখন গভীর রাত। কোথায় চিল? কোথায়? এ সেই আসল অশ্বিনীর আকাশ ভরা হ্রেষা। সে ছুটছে, তীব্র নীল জিজীবিষায় ছুটে যাচ্ছে অরণ্যের পর অরণ্য নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, আরও ছায়াপথ আরও নীহারিকার রুপোলি নির্জন, দশ দিকে দিঙনাগেদের উদ্ধত তর্জন বিশাল বিশাল লাফে পার হয়ে... ছুটছে।"[১৭]

বাণী বসু একজন নারী। তিনি তুলে ধরেছেন নারীর অস্তিত্বের সত্য। একজন নারীর নিজস্ব সত্তা যেখানে অবহেলিত নয়। মুক্তিকামী নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঘটে চলা অন্যায়-পীড়ন-অত্যাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে গড়ে তোলে প্রবল প্রতিরোধ।

> "এইজন্যে নারীর প্রতিবেদন আসলে সামাজিক প্রক্রিয়ার অন্য নাম। নারীচেতনা একই সঙ্গে জীবন ও জগৎ আর জীবন ও জগতে নারীর জায়মান অবস্থান সম্পর্কে যুগপৎ উপলব্ধির আশ্রয়।"[১৮]

একথা উপন্যাসে যথাযথ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মৈত্র, শেফালী। 'নৈতিকতা ও নারীবাদ'। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৭, পৃ. ২৪।

২. বসু, বাণী। 'অশ্বযোনি'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ: জুন ২০১৯, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, পৃ. ২৩।
৩. তদেব, পৃ. ২৮।
৪. তদেব, পৃ. ২৮।
৫. তদেব, পৃ. ৭৪।
৬. তদেব, পৃ. ৯৫।
৭. তদেব, পৃ. ৯৭।
৮. তদেব, পৃ. ১০৫।
৯. তদেব, পৃ. ১০৭।
১০. তদেব, পৃ. ১৫৮।
১১. তদেব, পৃ. ১৫৯।
১২. তদেব, পৃ. ১৫৯।
১৩. তদেব, পৃ. ১৬০।
১৪. তদেব, পৃ. ১৬১।
১৫. তদেব, পৃ. ৬৭।
১৬. তদেব, পৃ. ১০৪।
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৮।
১৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর। 'বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ'। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০১০, পৃ. ৬০।